BINOD BIHARI MAHATO KOYALANCHAL UNIVERSITY,DHANBAD

-:SYNOPSIS:-

OF

THE PROPOSED RESEARCH WORK FOR Ph.D. DEGREE

-:TITLE:-

SHRAMIK KABIR JIBON AALEKHYA-CHETONAR AALO: KESTO CHOTTOPADHYA
[শ্রমিক কবির জীবন আলেখ্য-চেতনার আলো : কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়]

RESEARCH SCHOLAR

SWAPAN PRAMANIK

S/O-RABINDRANATH PRAMANIK

VILL+P.O.-PULSITA,P.S.-KOLAGHAT

DIST-PURBA MEDINIPUR

WEST BENGAL

PIN-721154

SUPERVISOR

DR.JAYGOPAL MANDAL

ASSTT. PROFESSOR B.B.M.K.UNIVERSITY, DHANBAD

-:TITLE:-

<u>শ্রমিক কবির জীবন আলেখ্য-চেতনার আলো: কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়</u>

(Shramik kabir jibon aalekhya-chetanar aalo: kesto chattopadhya)

<u>Signature of the supervisor</u>

<u>Signature of the candidate</u>

<u>গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ **(Summary of Research Work)**</u>

গবেষণার প্রকরণ ও পদ্ধতি **(Research Methodology)**
'Research Methodology : Analytical And Descriptive Research'
Tools :
1) Data Collection and Analisis.
2) Collection from Library.
3) Purchased Books.
4) Interview with Poet and Contemporary Poets.
5) Use of Internet Through Computer, Smartphone and MS Word.

গবেষণার বিষয় **(Objective Of Research) :**
"শ্রমিক**-**কবির জীবন আলেখ্য,চেতনার আলো **:** কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়**"(Shramik kabir jiban aalekhya,chetonar aalo: kesto chottopadhya)**

"অনুমান**"(Hypothesis)**-ষাটের দশকের প্রেক্ষাপটে শ্রমিক কবির কাব্যপ্রযন্ত্র,সমকালীন সমাজ,রাজনীত, অর্থনীতি ও জীবনযন্ত্রনার প্রতিচ্ছবি।
"তাৎপর্য**"(Significance)**-কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যচর্চার মাধ্যমে এক কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্বের জীবনদর্শন,তাঁর উৎসর্গ,সমকালের ইতিহাসের ঐতিহাসিকতা তথা আদর্শ ব্যক্তি চরিত্র নির্মাণে প্রতীকী দ্যোতনা, যা বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধহীনতার জগতে গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমিকা **(Introduction)**
প্রথম অধ্যায়**(First Chapter)**-কবির জীবন-যাত্রার চড়াই-উৎরাই।
দ্বিতীয় অধ্যায় **(Second Chapter)**-সমকালীন বাংলা কবি ও কবিতার ধারায় কেষ্ট চট্টোপাধ্যা।
তৃতীয় অধ্যায় **(Third Chapter)**-কবি জীবনের উত্তরণ।
চতুর্থ অধ্যায় **(Fourth Chapter)**-শ্রমিকের কবিতায় শ্রমিক ও জীবনের কথা।
পঞ্চম অধ্যায় **(Fifth Chapte)-** বাংলা কবিতার ধারায় সনেটের বিনির্মাণ।
ষষ্ঠ অধ্যায় **(Sixth Chapter)**-শব্দবন্ধের কাব্যশৈলী।

"উপসংহার**" (Conclusion); Significant Of The Title/Subject**.
"তথ্যসূত্র**" (Reference)**
"গ্রন্থপঞ্জী**"(Bibliography);**
(ক) আকর গ্রন্থ(Primary Sources)
(খ) সহায়ক গ্রন্থ(Secondary Sources)
(গ) পত্রপত্রিকা(Journal)

মুখবন্ধ (preface)

বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি-পূর্বাশা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে পরিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছিল। একদিকে রবীন্দ্র বিরোধিতা আর অন্যদিকে রবীন্দ্র শ্রদ্ধা। সেই ধারার একটি অন্যতম অভিমুখ হল কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো কবিদের মার্কসীয় ভাবনা। এই ভাবনার ফলে শ্রেণীচেতনার হাতিয়ার হয়ে উঠল বাংলা কবিতা। স্বাভাবিকভাবে পরবর্তীকালে সেই ভাবধারায় নিবেশিত মানুষজন, যাঁরা তথাকথিত শিক্ষিত নন, কিন্তু ওই ভাবধারার উজ্জীবিত। যাঁরা দৈনিক কাজের নামমাত্র অবসরে সীমাবদ্ধ চিরকূটে কবি ভাবনার সার্থক আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। যা কল্পনারও অতীত। কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় এই ধারায় এক বিরল দৃষ্টান্ত। সেই কারণেই কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে পরম্পরার নিরিখে বিশ্লেষণ হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে তাঁর কবিতা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি বলেই তিনি আমার গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছেন। সব থেকে বড় কথা এই কবিকে কেন্দ্র করে এখনও একটিও গবেষণাধর্মী কাজ হয়নি। ফলে গবেষণা সন্দর্ভটিও হবে মৌলিক।

সূচি **:**

ভূমিকা **[Introduction]**

প্রথম অধ্যায়**:** কবির জীবন যাত্রার চড়াই**-**উৎরাই

[First chapter: kabir jibon jatrar charai-utrai]

দ্বিতীয় অধ্যায়**:** সমকালীন বাংলা কবিতার ধারায় কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

[Second chapter: samakalin bangla kabitar dharaya kabi kesto chottopadhya]

তৃতীয় অধ্যায়**:** কবি জীবনের উত্তরণ

[Third chapter: kabi jibonner uttoran]

চতুর্থ অধ্যায়**:** শ্রমিকের কবিতায় শ্রমিক ও জীবনের কথা

[Fourth chapter: shramiker kabitay shramik o jiboner katha]

পঞ্চম অধ্যায়**:** বাংলা কবিতার ধারায় **'**সনেট**'-**এর বিনির্মান

[Fifth chapter: bangla kabiter dharay sannet er binirman]

ষষ্ঠ অধ্যায়**:** শব্দবন্ধের কাব্যশৈলী

[Sixth chapter: shabdobandher kabboshili]

উপসংহার **[Conclusion]**

গ্রন্থপঞ্জী**: [Bibliography]**

ভূমিকা (Itroduction)

গোবিন্দচন্দ্র দাসকে উপলক্ষ করে 'স্বভাবকবি' আখ্যাটিকে বুদ্ধদেব বসু নির্ভূল বলে প্রমাণ করেছেন তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে। কারণ গোবিন্দচন্দ্র দাসের কাব্যে হৃদয়ের প্রাধান্য, প্রেরণার বাড়াবাড়ি; বিষয়বস্তু নিয়ে বুদ্ধির ছাপ নেই। রবীন্দ্র সমকালে বিশেষত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে নজরুল ইসলাম পর্যন্ত পর্বে এই ধরনের হৃদয়াবেগে ভরপুর কবি সংখ্যা বাংলাদেশে বড়ো কম ছিল না। রবীন্দ্র উপদ্রবে এই সমস্ত কবিরা স্বাতন্ত্র্যের খোঁজে রবীন্দ্রপথেই কালের পঙ্কে ডুবে গিয়েছিলেন। স্বাতন্ত্র্যহীনতায় বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের এই সকল কবিদের আর কেউ স্মরণ রাখে না। তবে এঁদের প্রভাবে পরবর্তী কবিদের একটা সুবিধে ঘটেছিল যে, তারা কোন পথে কাব্যসাধনায় ব্রতী হবেন সে পথের সন্ধান কবি জীবনের শুরুতেই করেছিলেন। বুদ্ধদেবের কথায় 'সর্তকবাণী'। রবীন্দ্র পরিমণ্ডল থেকে বেরোতে হলে তাঁর বিরোধিতা নয়, বরং চাই নতুন কিছু। তা অল্প হলেও ক্ষতি নেই। বুদ্ধদেব বসু তাই বলেছেন-
"...কবিতা লিখতে হলে এমন কাজ বেছে নিতে হবে যে কাজ তিনি করেন নি; তুলনায় তা ক্ষুদ্র হলে-ক্ষুদ্র হবারই সম্ভবনা-তা নিয়ে তৃপ্ত থাকা চাই"।[১]

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন,২০১০; কলকাতা,পৃ.১৫০]

বাংলা কাব্য সাহিত্যের আকাশে নানা পালাবদল ঘটেছে। পরিবর্তন ঘটেছে কাব্যাঙ্গিকের। বাংলা কাব্যে স্বভাবকবি, বিদ্রোহী কবি, মরুকবি, দুখবাদী কবি, রসের কবি, জীবনশিল্পী প্রেমিক কবি, পদাতিক কবির মতো উজ্জ্বল নক্ষত্রদের ছড়াছড়ি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি আমরা এমন এক কবিকে পাই যিনি একহাতে ইস্পাত কারখানার যন্ত্রপাতি নিয়ে অবিরাম কর্মে লিপ্ত, আর অন্য হাতে কারখানারই যন্ত্রাংশের নাম লেখা চিরকূটের অপরপৃষ্ঠায় লিখেছেন দু'চার ছত্র পঙক্তি। অশীতিপর হলেও যাঁর লেখনি এখনও থামেনি, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যার লেখা সাদরে প্রকাশিত হচ্ছে, তিনি হলেন 'শ্রমিক কবি' কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়। একজন শ্রমিক অথচ কবি, যা বাংলা সাহিত্যে বিরল। হয়তো এই কারণেই বর্তমানের আর এক কবি শ্রীজয় সোসাল সাইটে কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়কে 'কাব্যশ্রমিক' আখ্যা দিয়েছেন। যর্থাথই তাই। তিনি লিখছেন,

"...ওই দেখ কাব্যশ্রমিক
ইস্পাতের গলন্ত লাভায়
শরীর সেঁকে নেয়
লেখে কাজের মেয়ের নিত্যলীলা
প্রতিটি গাছে পাখি আসে গান গায়
যেমন গান গায় ' হাতুড়ি ও কাস্তে'

শ্রমিকও কবি হয় কবিও শ্রমিক...”[২] [স্যোসাল সাইট, ফেসবুক]

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় স্বঘোষিত শ্রমিক কবি। তাঁর কাব্যের মধ্যে উঠে এসেছে নিজস্ব প্রত্যয়ে বামপন্থা দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মানুভূতি, সমাজচেতনা। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় কাজ করার সূত্রে ওই অঞ্চলে শ্রমিক কবি রূপে ব্যাপক খ্যাতি তাঁর। কবি বেশ কয়েকটি বিশেষ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু বৃহত্তর অংশে এখনও তিনি যথাযোগ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত।

<u>তথ্যসূত্র:</u>

১. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন,২০১০; কলকাতা,পৃ.১৫০

২. স্যোসাল সাইট, ফেসবুক

প্রথম অধ্যায় : <u>কবির জীবন যাত্রার চড়াই-উৎরাই</u>

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন- “আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুঁতোরের, মুটে মজুরের, - আমি কবি যত ইতরের।”[১] [প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা,আমি কবি যত কামারের,২০০১,দেজ পাবলিশিং;কলকাতা,পৃ.২৫] কবি কি আদৌ এই এই সমস্ত পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, না তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছিলেন। কোনওটাই নয়। আসলে এদের প্রতি প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছিল সহমর্মিতা। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের পালা বদলের ইতিহাসে বহু প্রখ্যাত কবির আবির্ভাব ঘটেছে। যাঁরা উপরের তলায় বসে নীচের তলার মানুষের জয়গান গেয়েছেন। কিন্তু একজন মানুষ, যিনি কিনা দেহ-মনে-প্রাণে শ্রমিক। তিনি যখন শ্রমিকের জীবন-ইতিহাস তুলে ধরেন, তখন তার মধ্যে ফুটে ওঠে অনন্য জীবনাভাষ। অনিবার্য কারণেই তাঁর সৃজনীর ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত হয় জীবন জিজ্ঞাসা। সেখানে শুধু সহমর্মিতা নয়, স্বসত্তায় জেগে ওঠে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। ষাটের দশকে এমনই একজন কবিকে পেলাম যিনি একহাতে ইস্পাত কারখানার যন্ত্রাংশ নিয়ে অবিরাম কর্মে লিপ্ত, অন্যদিকে অবসরের চিরকূটে লিখে চলেছেন জীবন অভিজ্ঞতার জিজ্ঞাসার লিপি। তিনি স্বঘোষিত শ্রমিক কবি, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়।

শ্রমিক কবির জীবনযাত্রা বেশ সর্পিল। জন্ম ১৯৩৪ সালের ২২শে মে, বিহারের সাসারামে। বাবা উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন স্টেশন মাষ্টার। মা বীণাপানী দেবী ছিলেন মায়ের মতো। পিতা ব্রিটিশ বিরোধী, উদার ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ ছিলেন। বাবার কাজের বদলির সূত্রে কোনও একজায়গায় স্থায়ী বসবাস হয়নি কবি-পরিবারের। যাযাবর জীবনের প্রথম বসবাসের স্মৃতি কবির কথায় বংশবাটি। সামনে রেল স্টেশন, ট্রেনের আসা-যাওয়া, রামশকুল নামে স্টেশনের এক ব্যক্তি, রেলের আমবাগান, এই ধরনের কয়েকটি টুকরো ছবি ছাড়া সেই সময়ের কবির কিছু মনে নেই। বংশবাটির পর সিঙ্গুরবাস। শৈশবের ঘটনাগুলির মধ্যে সিঙ্গুরের ছবিই কবির চোখে বেশি করে ফুটে ওঠে। দুটি স্কুল ছিল, একটা ছেলেদের অন্যটি মেয়েদের। জুটে যায় সঙ্গীও। এখানে বাসকালেই কবির বিশেষ প্রতিভা ফুটবল খেলা শুরু হয়। নিজে যে শুধু খেলতেন তাই নয়, বড় বড় টুর্নামেন্টের খেলা দেখতে ছুটতেন। হয়ত সেই অভিজ্ঞতাই তাঁকে ভালো খেলোয়াড় তৈরিতে সাহায্য করত। পিতার মামাতো ভাই স্মরজিৎ কাঞ্জিলালের সান্নিধ্যে এসে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কবিকে পেয়ে বসেছিলো। গান শিখবার জন্য কিনেছিলেন একটি হারমোনিয়ামও। সঙ্গীতের সুর কানে ভেসে এলেই তিনি বিভোর হয়ে শুনতেন। হুগলীর শ্রীরামপুরে চলে আসার পর তিনি গঙ্গার সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। যদিও এখানে আসার পর তাঁর খেলাধূলো বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীরামপুর টকিজ থেকে ভেসে আসা গান কবির মন-প্রাণ জুড়িয়ে দিত।

সালটা ১৯৪৬। শ্রীরামপুরের পর্ব চুকিয়ে কবিরা চলে আসেন দুর্গাপুরে। আবার শুরু হল খেলাধূলো। বাইরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবও ঘরের মধ্যে ধাক্কা মারত মাঝেমধ্যেই। কবির বড় ভগ্নিপতি কমরেড ডঃ নরেশ ব্যানার্জী তখন খিদিরপুর ডকের দলের নেতৃত্বে ছিলেন। দাদা জ্যোতিবিকাশ ছিলেন তাঁর শিষ্য। ভারত স্বাধীনতা পেলেও, কমিউনিষ্ট পার্টিকে মেনে নিতে পারেনি। তাই এই পার্টিকে বেআইনী ঘোষনা করে কংগ্রেস। ১৯৪৭ এর দেশভাগ,উত্তাল পরিবেশ। কবি তখন তারকনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠরত। অতটা জ্ঞান না হলেও চোখের সামনে রাজনৈতিক অস্থির পরিবেশ লক্ষ করেছেন। দাদা ধরা পড়ার পর হুগলি জেলে তার স্থান হয়। ১৯৪৯ সাল নাগাদ দুর্গাপুর থেকে কবিরা চলে আসেন সকরিগলি ঘাটে। বাংলার সীমানা বলা যায়, আরেকটু এগিয়ে গেলেই সাহেবগঞ্জ বিহার। আসামের সঙ্গে যোগাযোগের একটাই ট্রেন চলত, তার নাম আসাম লিঙ্ক। কবি এখানে রামপুরহাট স্কুলে পড়তেন। থাকতেন ছাত্রাবাসে। খেলাধূলোর পারদর্শিতা দেখে খেলার শিক্ষক মুকুন্দ বিহারী সাহা খুব ভালোবাসতেন কবিকে।

১৯৫২ সালে বাবা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর পাকাপাকিভাবে চলে আসেন বারাসাতের নবপল্লীতে। এখানেই সুভাষ ক্লাবে যোগ দিয়ে কবি ফুটবল খেলায় ভালো নাম অর্জন করেন। মুশকিল হয়েছিলো দাদাকে নিয়ে। জেল থেকে বেরনোর পর, বাবা তার উন্নতির জন্য এবং ওই পথ থেকে সরে আসার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করলেও, সেগুলিকে হয় রাজনৈতিক না হয় সামাজিক বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতেন। ওষুধ দোকান করে দিলে সেখানে রাজনৈতিক

আড্ডায় জমে থাকত। ফলে বাড়িতে অর্থসঙ্কট ক্রমেই বাড়তে থাকে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যা হয়। শেষ পর্যন্ত বাড়ি ভাড়া দিয়ে কোনওরকমে থাকার চেষ্টা। তাতেও কুলোতে না পেরে বাড়ি বিক্রি এবং ভাড়া বাড়িতে থাকার সংস্থান হয়। পরে অবশ্য জ্যোতিবিকাশ ঘুরে দাঁড়ান, সফলও হন।

বারাসাতে থাকাকালীন কবি একবার প্রেমে পড়লেও তাকে নিয়ে তাঁর কবিতা রচনা করা হয়ে ওঠেনি। বরং সামাজিক দুঃখ কষ্ট নিয়ে তাঁর লেখনীর সূত্রপাত। আর সেখান থেকেই তাঁর জিজ্ঞাসা। ১৯৫৮ সালে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় অস্থায়ী কর্মীরূপে যোগদান। কবি জীবনের মোড় নেয় অন্যদিকে। ১৯৬২ সালে দুর্গাপুর যুব উৎসবে কবিতা পাঠ এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, মার্কসবাদীর সদস্যপদ লাভ করেন। এক এক করে ইউনিয়ন কাউন্সিল মেম্বার হন, ১৯৬৫ সালে কালচার বিভাগের কনভেনর। ১৯৭২ সালে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। নিজে শ্রমিক এবং শ্রমিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ, তাঁকে শ্রমিকদের জন্য কলম ধরতে বাধ্য করেছিলো। ১৯৯০ সালে চাকরি থেকে অবসর। থাকার জায়গা সল্টলেকে দাদার বাড়ি। এরপর তার লেখনী নদীর স্রোতের মতো বইতে শুরু করে। তাঁর জীবন প্রবাহের বিভিন্ন মুহূর্তে সমাজ-জীবন-রাজনীতি নিয়ে যে সকল প্রশ্ন জেগেছিলো তা ধরা পড়েছে, তাঁর কাব্যের পরতে পরতে। সহজ বিষয়কে সহজ করে নিয়েই এগিয়েছেন কবি। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কবিতা লেখা নয়, বরং অন্তরের তাগিদেই সৃজিত হয়েছে ভুরি ভুরি ছত্র। তাঁর না আছে ফাইল ভর্তি শিক্ষার ডিক্রি, না আছে পোষাকে আষাকে বিলাসীতার রঙচঙে আবরণ। আর না আছে নিজেকে জোর করে প্রতিষ্ঠিত করার বাসনা। তাই আজও হয়ত তিনি পরিচিতির গন্ডী থেকে যোজন দূরে। যদিও তিনি অজস্র পত্র পত্রিকায় এখনও লিখে চলেছেন, আর সেই লেখনী দিয়ে কবির আত্মবিশ্বাস, প্রতিবাদ আর নানা জিজ্ঞাসা প্রকট প্রচ্ছন্নতায় ধরা পড়েছে।

<u>তথ্যসূত্র:</u>

১. প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা,আমি কবি যত কামারের,২০০১,দেজ পাবলিশিং;কলকাতা,পৃ.২৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : <u>সমকালীন বাংলা কবিতার ধারায় কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়</u>

দশকওয়াড়ি কবি বিভাজনের ক্ষেত্রে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে কবির জন্মসন, আবার অনেকেই প্রথম কাব্য প্রকাশের সময়কে নির্দিষ্ট করে কবিদের সেই দশকের মধ্যে ফেলতে চান। সেই হিসেবে কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়কে কোন দশকের কবি বলব? ষাটের দশকের বৈশিষ্ট তুলে ধরতে গিয়ে প্রদ্যোত সেনগুপ্ত তাঁর 'অন্যদিগন্ত: ষাটের কবিতা' অংশে বলছেন-

"বাংলা কাব্যক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে যেসব কবিরা জন্মগ্রহণ করেছেন-এমন কবিরাই ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কাব্যচর্চায় রত।"[১] [তরুণ মুখোপাধ্যায়,ছয় দশকঃনয় কবি,২০০৬,সহযত্রী প্রকাশন;কলকাতা পৃ.১০] আবার অধ্যাপক তরুণ মুখেপাধ্যায় বলছেন জন্মসাল অপেক্ষা প্রথম কাব্য কিংবা মৌলিক কবিতা প্রকাশের সালকে গুরুত্ব দিলে উচিত বিচার হয়। এই দুই দিক থেকে দেখলেই কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়কে ষাটের দশকের কবি বলতে কোনও অসুবিধে হয় না। কারণ কবির জন্মসন ১৯৩৪। অন্যদিকে তাঁর প্রথম মৌলিক কবিতা পাঠের জন্য ১৯৬২ সালে দূর্গাপুরে অনুষ্ঠিত যুব উৎসব থেকে পুরষ্কৃত হন। এরপর থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখালিখি প্রকাশিত হতে শুরু করে।

এখন দেখা যাক এই পর্বে বা দশকের কবিদের মধ্যে কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় কতখানি ব্যতিক্রমী। রবীন্দ্রভাবাদর্শের বিপরীতে গিয়ে বাংলা কাব্যে নতুন সুর এনেছিলেন তিরিশের কবিরা। জগৎ ও জীবনকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছিলেন এঁরা। এই পর্বে আমরা পেলাম নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মতো কবিকে। চল্লিশের কবিদের কালমার্ক্স ও লেলিন ভাবনা যেমন উদ্দীপিত করল, তেমনি গোর্কি, মায়াকোভস্কির চিন্তাধারা প্রভাবিত করল তাঁদের। তেভাগা আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কর্মকান্ড কবিতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে গেল। সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো কবিরা ভিড় করলেন এই পর্বে। নিজস্ব ঘরানার ডালি নিয়ে এবং কবিতার ক্লাস নিয়েছিলেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। পঞ্চাশের কবিদের কাব্যে এল নানা বৈচিত্র। যৌনতার রূপ ভাষায় অনাবৃত হল। ভিন্ন মাত্রা পেল প্রেম ভাবনা, সাম্য-শোষণের চিত্র।

ষাটের দশকের কবিদের মধ্যে পূর্বজ কবিদের ছায়া পড়ল ঠিকই, একইসঙ্গে স্বাতন্ত্র্যও ধরা পড়ল। এই দশকের কবিদের মধ্যে রয়েছেন তুষার রায়, কবিরুল ইসলাম, দীপেন রায়, মলয় রায়চৌধুরি, নীরেন্দু হাজরা, গনেশ বসু, উৎপল কুমার বসু, সমীর রায়চৌধুরি, দেবী রায়, কৃষ্ণা বসু, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অলোক সরকার, আশিষ সান্যাল প্রমুখ। কবি মনীন্দ্র গুপ্ত চল্লিশের দশক থেকে লিখলেও প্রথম কবিতার বই 'নীল পাথরের আকাশ' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। হাংরি জেনারেশন ও কাব্যান্দোলন বাংলা কবিতায় মোড় ঘুরিয়েছিল এই পর্বে। কাব্যান্দোলনের প্রবক্তা মলয় রায়চৌধুরির কথায়, "...কবিতা ব্যক্ত করবে মানবিক, দৈহিক এবং শারীরিক ক্ষুধার কথা।"[২] [ড.অশোক কুমার মিশ্র,আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা,২০১৩,দেজ পাবলিশিং;কলকাতা,পৃ.৩৭৭] যদিও হাংরির এই কবিরা বিভিন্ন কারণে নিন্দিত। কারণ তাঁরা প্রচলিত নিয়মের বাইরে যেতে গিয়ে আচরণে স্বাভাবিকতা নষ্ট করে দিয়েছে। আপাত কুৎসিত বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তবুও এই সময়ের কবিদের লেখনীতেও বেশ কিছু উৎকৃষ্ট কাব্যফসসল পাওয়া গেল। মলয় রায়চৌধুরির কাব্য 'শয়তানের মুখ'(১৯৬৩), 'তুষার রায়ের 'ব্যান্ড মাষ্টার'(১৯৬৯), 'মরুভূমির আকাশে তারা'(১৯৭৪), দীপেন রায়ের 'রাখাল বালকের সাথে'(১৯৭৩), গনেশ বসুর

'নিজের মুখোমুখি'(১৯৬৭) প্রভৃতি। এই পর্বে এক স্বতন্ত্র ভাবনার, নতুন দৃষ্টিকোণের কবি হলেন কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দর্শন, সমাজভাবনা, আত্মানুভূতি, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি কবিকে সমকালের থেকে অনেকটাই পৃথক করে রেখেছে বলা যায়। অন্যান্য কবিরা দূর থেকে শ্রমিকদের দেখেছেন, কাহিনী রচনা করেছেন। কিন্তু কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় নিজেই একজন শ্রমিক। তাঁর সঙ্গে শ্রমিকের সর্ম্পক রক্তের। সেই কারণেই তাঁর কাব্যে শ্রমিকের গাথা জীবন্ত পল্লবিত হয়েছে। কবির কাব্যের নাম সংগত কারণেই 'কবি কারো দাস নয়'। তিনি ভালো চোখে দেখেননি কিছু পাওয়ার জন্য রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর কাছে শিল্পীদের মেরুদন্ড হারিয়ে যাওয়াকে। সমাজের উপর শিল্পীর দায়বদ্ধতার অস্বীকারকে। তবুও তিনি আশাবাদী। একদিন প্রতিবাদ হবে, শিল্পী তাঁর দায়িত্ব বুঝে নেবে, মানবিকতার জয়ধ্বনি শোনা যাবে। 'সুকান্ত' কবিতায় কবি বলছেন-

"তবুও আশায় থাকি ঘুম নেই রাতে
বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে এ জীবন কাটে"[৩] [কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়,শ্রমিক কবির প্রতিবাদী কবিতা,২০১৬,শ্রমশ্রী প্রকাশন;কলকাতা,পৃ.৪৯]

'সব পথ ঘুরে' কবিতায় তিনি বলছেন-

'এইভাবে বাঁচুক সবাই
গড়ে তুলুক বিশ্বাসে এভাবেই মানুষের উজ্জ্বল স্বাক্ষর...'[৪] [কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়,শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ,২০১২,নবজাতক প্রকাশন;কলকাতা,পৃ.২৯]

<u>তথ্যসূত্র:</u>

১. তরুণ মুখোপাধ্যায়,ছয় দশকঃনয় কবি,২০০৬,সহযাত্রী প্রকাশন;কলকাতা পৃ.১০
২. ড.অশোক কুমার মিশ্র,আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা,২০১৩,দেজ পাবলিশিং;কলকাতা,পৃ.৩৭৭
৩. কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়,শ্রমিক কবির প্রতিবাদী কবিতা,২০১৬,শ্রমশ্রী প্রকাশন;কলকাতা,পৃ.৪৯
৪. কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়,শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ,২০১২,নবজাতক প্রকাশন;কলকাতা,পৃ.২৯

তৃতীয় অধ্যায়: কবি জীবনের উত্তরণ

কবি হওয়ার লক্ষ্যে নয়, বরং ভেতরের একটি তাগিদেই লেখার জন্ম। সালটা ১৯৪৬-৪৭ নাগাদ। প্রথম জীবনের আবেগভরা ছোটো-বড় বেশ কিছু কবিতা লেখেন কবি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই কবিতার খাতা পাওয়া যায়নি। কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'বসুমতি' পত্রিকায় ১৯৫৭-এর মাঝামাঝি। এরপর 'স্বগত সাহিত্য', 'যাত্রিক', 'মাঠ-ময়দান-কারখানা' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম জীবনে কবিতা লেখার প্রেরণার কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, "আমি অনেক কবিতা পড়তাম, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকুমারী দেবীর মতো সাহিত্যিকদের। একইসঙ্গে খেলাধূলা এবং গান শোনার নেশা ছিল প্রবল। হয়তো সেই কারণেই কবিতা লেখার প্রতি একটা ঝোঁক তৈরি হয়।"[১] [সাক্ষাৎকার সংগ্রহ]কোন ধরণের গান শুনতেন? কবির উত্তর-ধ্রুপদী সংগীত। এক্ষেত্রে বড় প্রেরণা ছিল দূর সর্ম্পকের এক কাকা, সরজিৎ কাঞ্জিলাল। ইনি ছিলেন কবির পিতার মামাতো ভাই। যিনি লক্ষৌর বিখ্যাত কলেজ থেকে সঙ্গীত বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। কবি সময় পেলেই এঁনার কাছ থেকে গান শুনতেন। এছাড়া রামপুরহাট, শ্রীরামপুরে থাকাকালীন সেই সময় সিনেমা হলে যে গান বাজানো তিনি অনেক শুনতেন। দুর্গাপুরে কারখানার শ্রমিক থাকাকালীন একদিকে কর্ম, অন্যদিকে সৃষ্টিশীল মনোভাবনা বিকশিত হয়েছে সীমাবদ্ধ চিরকূটে। চার দেওয়ালবদ্ধ প্রথাগত শিক্ষার ভুরি ভুরি ডিক্রি ছাড়াই তাঁর দার্শনিকতা পৌঁছে গেছে বিশ্বজনীনতায়। কবির প্রতিবাদের স্বর মুখরিত হয়েছে 'শ্রমিক কবির প্রতিবাদ কবিতা'(২০১৩) কাব্যগ্রন্থে। ১৯৯০-এ কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি একের পর এক কাব্য লিখে চলেছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁর কুড়িটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শরিক না হলে' প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। একে একে 'স্বাধীনের এই স্বাদ'(১৯৭৬), 'কবি কারো দাস নয়'(১৯৯০), 'চর্তুদশপদী কবিতা'(১৯৯৭), 'কমরেডস্, লাইনটা সোজা করুন'(১৯৯৭), 'দিন, অস্ত্র দিন'(২০১১),'আমাদের কাজের মাসি'(২০১৮) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আরও একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার মুখে।

তথ্যসূত্র:

১. সাক্ষাৎকার সংগ্রহ

চতুর্থ অধ্যায়: <u>শ্রমিক কবির কাব্যে শ্রমিক ও জীবনের কথা</u>

বাংলা কাব্যসাহিত্যে তিরিশ, চল্লিশ, কিংবা পঞ্চাশের দশক যেভাবে জায়গা করে নিয়েছে, ঠিক একই সুর শোনা যায় না ষাটের দশককে কেন্দ্র করে। এই দশকের কবিরা ঠিক কোন ভাবাদর্শকে সামনে রেখে এগোতে চেয়েছিলেন তা নিয়ে বাগবিতন্ডার অন্ত নেই। ষাটের দশকের কবিদের উপর অগ্রজ কবিদের বিশেষ করে জীবনানন্দ থেকে শুরু করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছায়া পড়েছিল। ষাটের দশকের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে মণীন্দ্র গুপ্ত মোটামুটিভাবে স্বাভাবিক, ঘরোয়া, মধ্যপন্থী মানুষদেরই সমবায় বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীগুপ্তের মতে, ষাটের কবিরা দলহীনদের একটা দল। তথাপি এই সময়ের কবিদের কাব্যে প্রভাব ফেলেছিল বেশ কয়েকটি ঘটনা। হাংরি আন্দোলন, শ্রুতি আন্দোলন, বাংলার খাদ্য আন্দোলন ও ধর্মঘট, কেরালায় কমিউনিস্ট সরকার ভাঙন, ভিয়েতনামে মুক্তিযুদ্ধ, ভারত-চীন সীমান্তে যুদ্ধ, নেলসন ম্যান্ডেলার যাবজ্জীবন কারাদন্ডদেশ, পশ্চিমবঙ্গে ব্রামফন্টের জয়লাভ, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি, সন্ত্রাস-অত্যাচার প্রভৃতি ঘটনায় অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে এই দশক। এই দশকে স্বঘোষিত শ্রমিক কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়।

কবি তথাকথিত বিশাল ডিগ্রিধারী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি নন। দূর্গাপুর কারখানার স্থায়ী কর্মী হওয়ার সূত্রে সেখানকার জীবনযাত্রা, দৈনিক কর্মকান্ড কবির মজ্জাগত হয়ে আছে। তাঁর কাব্যে শ্রমিক শ্রেণী সেই জন্যই জীবন্ত। তিনি মানবতার কবি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শরিক না হলে'-তে পাই-

"...প্রতিদিন নিয়ে যায় সৃষ্টিছাড়া এ সৃষ্টিকে
অনির্দিষ্ট গতি থেকে সুনির্দিষ্ট পথে
তোমার সে অদৃশ্য অঙ্গুলি
মানবের মানবত্বে বারবার।"[১] [কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়,শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ,২০১২,নবজাতক প্রকাশন;কলকাতা,পৃ.১৭] জীবনে কৃতকার্য হতে কে না চায়। কিন্তু সেই স্বপ্নপূরণ করতে হলে, সত্যি করতে হলে অর্থই কবির কাছে প্রধান বলে মনে হয়েছে। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কবিতার পটভূমি সংবাদ'-এ পাই 'সহস্র ইচ্ছাকে দড়ি বাঁধে অর্থের অসহযোগ'।[২] [কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়,শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ,২০১২, নবজাতক প্রকাশন; কলকাতা,পৃ.২৭] 'মুখুজ্যে মশায় আপনি কি কৃতকার্য হলেন' কবিতায় কবি যেন ধনতন্ত্র বিনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ভিয়েতনামের উপর মার্কিনী আক্রমণ কিংবা কেরালায় কমিউনিস্ট ভাঙনকে ভালো চোখে দেখেননি-

"...অতঃপর ধনতন্ত্র কি আত্মহত্যা করবে অনায়াস!
ভিয়েৎনাম, কঙ্গো, কিউবা, ডোমিনিকান, এশিয়া-আফ্রিকা
কোথায় ক্রুশ্চভের নির্বিবাদ গলা..
কেরালায় কার কন্ঠস্বর?"[৩] [কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়,শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ,২০১২,নবজাতক প্রকাশন;কলকাতা,পৃ.২৮]

শ্রমিকের অধিকার নিয়ে বারবার কলম ধরেছেন তিনি। পৌঁছে গিয়েছেন বিশ্ববোধে। 'ব্যুরোক্র্যাট' কবিতায় তিনি লিখছেন-

"...শ্রমে ঘাম দিয়ে যাও সব কিছু বিনীত সম্মান
নচেৎ একত্র হও, রক্ষা করো রক্তে অধিকার
মুক্ত করো এ লাঞ্ছনা, কেটে যাক বিপন্ন আঁধার।"[৪] [কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়,শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ,২০১২,নবজাতক প্রকাশন;কলকাতা,পৃ.৩৫]

এই কবিই 'কিছু তো দাঁড়িয়ে নেই' কাব্যগ্রন্থে সোচ্চারে বলে ওঠেন- "আমরা সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে আছি তবু, কাউকে খুশি করার জন্য লিখি না। প্রথম যখন লিখি তখন কিছু পাবার জন্যও লিখিনি, চরম দুর্দিনেও না। বরং যা লিখেছি তা মানুষের জন্যিই লিখেছি। এখনো সেই পথেই আমাদের ক্লান্তিহীন যাত্রা।"[৫] [কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়,শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ,২০১২,নবজাতক প্রকাশন;কলকাতা,পৃ.১৮১]

কবির একটি অসামান্য কাব্যগ্রন্থ 'কমরেডস্ লাইনটা সোজা করুন'। নামকরণেই স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি। যদিও এই ভাঙনের মুহূর্তে কবি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাস রেখেছেন। পাশাপাশি মায়োকোভস্কির সতর্কবাণী কতখানি ভবিষ্যদবাণী ছিল তাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। মায়োকোভস্কি' কবিতায় তিনি বলছেন-

"সেদিন তোমার সতর্কবাণী কেউ-ই শোনেনি।
তবু, অসঙ্গতির শিখা নেভাতে বহু চেষ্টা করে গেছ তুমি.."[৬] [কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়,শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ,২০১২,নবজাতক প্রকাশন;কলকাতা,পৃ.১৫১]

রোমান্টিক কবি না হলেও কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যে প্রেমভাবনা, সময়ভাবনা ভিড় করেছে। তাঁর শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'দিন, অস্ত্র দিন'(২০১১)। সময়টা বাংলার বামপন্থী রাজনীতিতে এক গভীর সঙ্কটকাল। যে কালের মুখোমুখি শিরদাঁড়া সোজা করে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছেন জীবনাদর্শের প্রতি অটল স্থিতধীর কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়। যিনি প্রথমেই এবং সারাজীবন মূলত শ্রমিক এবং সেই সোচ্চারিত কন্ঠে কবিও। এখানে তিনি অসহ্য পীড়ন থেকে নিস্তার পেতে যুদ্ধাস্ত্র হাতে তুলে নিচ্ছেন-

" না
ঘুরে দাঁড়াতে হবে
যুদ্ধে যাব, অস্ত্র দিন
....
অসহ্য পীড়নে বিদ্ধ
নেই, কোনোখানে কোথাও নিস্তার।"[৭] [কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ, ২০১২, নবজাতক প্রকাশন; কলকাতা,পৃ.২০৪]

তথ্যসূত্র:
১. কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়,শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ,২০১২,নবজাতক প্রকাশন;কলকাতা,পৃ.১৭
২. কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়,শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ,২০১২, নবজাতক প্রকাশন; কলকাতা,পৃ.২৭
৩. কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়,শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ,২০১২,নবজাতক প্রকাশন;কলকাতা,পৃ.২৮
৪. কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়,শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ,২০১২,নবজাতক প্রকাশন;কলকাতা,পৃ.৩৫
৫. কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়,শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ,২০১২,নবজাতক প্রকাশন;কলকাতা,পৃ.১৮১
৬. কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়,শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ,২০১২,নবজাতক প্রকাশন;কলকাতা,পৃ.১৫১
৭. কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়,শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ,২০১২,নবজাতক প্রকাশন;কলকাতা,পৃ.২০৪

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলা কবিতার ধারায় 'সনেট'-এর বির্নিমান

চর্তুদশ শতকে ইতালির কবি পেত্রার্কের হাতে গীতিকবিতার একটি বিশেষ রূপ সনেটের জন্ম। চোদ্দ পঙক্তি বিশিষ্ট ও একটি নির্দিষ্ট ছন্দ কাঠামোর মধ্যে দিয়ে এই কবিতার কায়া নির্মিত হয়। যার মধ্যে থাকে অখন্ড ভাবকল্পনা। পেত্রার্কের নামানুসারে 'পেত্রার্কীয় সনেট' নামটি প্রচলিত। অষ্টক্ ও ষটক্ বিভাজনের মাধ্যমে সনেটের পথ চলা শুরু হয়। পেত্রার্কীয় সনেটের রীতি মিলটন ও ওয়াডর্সওয়ার্থ অনুসরণ করলেও পরবর্তিকালে সনেটের অর্ন্তগঠনে নানান অদল-বদল ঘটে। শেকসপীয়র ইতালীয় সনেট কাঠামো থেকে কিছুটা সরে এসে অষ্টক্ ও ষটক্-এর পরিবর্তে তিনটি 'চতুষ্ক' এবং শেষে একটি 'দ্বিপদিকা' ব্যবহার করলেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সনেট নিমার্ণের প্রথম কারিগর মধুসূদন দত্ত। এরপর দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল মজুমদার থেকে শুরু করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত প্রমুখরা বাংলা সনেটকে বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মধুসূদন পেত্রার্ক ও শেকসপীয়র দুই রীতিতেই সনেট নির্মাণ করেন। বাংলা সনেটের প্রথাগত রীতি ভেঙে অভিনব কায়দায় সনেট বুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরি। রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' ও 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলি তার পরিচয় বহন করছে। প্রমথ চৌধুরি পেত্রার্কীয় রীতির সঙ্গে ফরাসি সনেট রীতির মিশ্রণ ঘটালেন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের অনান্য শাখার ধারা অব্যাহত থাকলেও সনেটের নির্দশন নেই বললেই চলে। অথচ ষাটের দশকে একজন শ্রমিক কবির কড়া ও কালি পড়া হাতে দু'শোর অধিক সার্থক সনেট রচনা কি সত্যিই বিস্ময়ের নয়? কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় সনেট রচনায় কতখানি সিদ্ধহস্ত ছিলেন তা তাঁর 'চর্তুদশপদী কবিতা'(১৯৯৭) এবং' 'আরো চর্তুদশপদী কবিতা'(২০১৮) গ্রন্থদুটি পাঠ করলেই চাক্ষুষ হবে। তিনি সনেটের সীমাবদ্ধ রীতিনীতি মেনে

কাব্যচর্চায় যে অপরিসীম অনুশীলন করেছেন তা এককথায় অভাবনীয়। বিস্তৃত গবেষণার ফসল হয়ে উঠেছে এই কবিতাগুলি।

ষষ্ঠ অধ্যায়: শব্দবন্ধে কাব্যশৈলী

বুঁফো বলেছিলেন ' style is the man himself.' এই স্টাইল সংস্কৃত আলংকারিকদের ভাষায় রীতি। রবীন্দ্রনাথের লেখার এক স্টাইল আবার বিভুতিভূষণের আর এক স্টাইল। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কথায়, চিন্তার একটি স্বতন্ত্র ধারা হল এই স্টাইল। এককথায় লেখার যে গঠনরীতির মধ্যে দিয়ে সাহিত্যিককে সহজেই চিনে নিতে পারি, সেই গঠনভঙ্গিই হল ওই সাহিত্যিকের নিজস্ব স্টাইল। কাব্যের শৈলী বিচার করতে হলে বাক্যের আদর্শ গঠন, বিচ্যুতি, অধোগঠন-অধিগঠন, ছন্দ-অলংকার, শব্দ নির্বাচনের পাশাপাশি আনুসঙ্গিক কতগুলো বিষয় মাথায় রাখতে হয়। এখন আমরা কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যের স্টাইল নিয়ে আলোচনা করব এই অধ্যায়ে।

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যশৈলী নিমার্ণের ক্ষেত্রে ভাষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিন পঙক্তি থেকে শুরু করে আশি পঙক্তির কবিতাও দুলর্ভ নয় তাঁর কাব্যে। 'জল দাও' কবিতাটিতে তিনটি চরণ। ‘দাবদাহে ক্লান্ত,তৃষ্ণার্ত পথিক এসেছে/বিনীতভাবে দ্বার খুলে দেখো/বসাও, জল দাও, ছায়া’।[১] [কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ,২০১২, নবজাতক প্রকাশন;কলকাতা,পৃ.১৫৮] আবার 'সব পথ ঘুরে' কবিতায় চারটি অনুচ্ছেদে প্রায় পঁচাশিটি চরণ ব্যবহৃত হয়েছে। কবি শেক্সপীরিয়ান ও পেত্রার্কীয় রীতিতে দু'শোর বেশি সনেট রচনা করেছেন। যা বাংলা সাহিত্যে বিরল। রীতি মেনে সনেট রচনা করতে গিয়ে অনেকেই ব্যর্থ সলিলে ডুব দিয়েছেন। কিন্তু কবি সেদিক থেকে যথার্থই সাফল্য অজর্ন করেছেন। অধ্যাপক তরুণ মুখোপাধ্যায় কবি সম্পর্কে বলেছেন-'সনেট রচনা সব কবির পক্ষে সম্ভব নয়। পরিমিতিবোধ ও বাকসংযম দরকার। কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।'[২] [তরুণ মুখোপাধ্যায়, ছয় দশক: নয় কবি,২০০৬,সহযাত্রী প্রকাশন; কলকাতা,পৃ.৮৪] তাঁর কাব্যে আছে চিত্রকল্প, শব্দের মার্জিত ব্যবহার, রয়েছে ছন্দ-অলংকারের ব্যবহারও।

তথ্যসূত্র:

১. কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ,২০১২, নবজাতক প্রকাশন;কলকাতা,পৃ.১৫৮
২. তরুণ মুখোপাধ্যায়, ছয় দশক: নয় কবি,২০০৬,সহযাত্রী প্রকাশন; কলকাতা,পৃ.৮৪

উপসংহার

কোনও কবিকেই একটি নির্দিষ্ট দশকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কেও একই কথা খাটে। ষাটের ঘটনাবলী যেমন, তেমনি সত্তর,আশি, নব্বই এমনকি একবিংশ শতাব্দীর যন্ত্রণাদীর্ণ অগ্নিবলয়ও কবির জীবনে প্রভাব ফেলেছিল। যার চিহ্ন পড়েছে তাঁর কাব্যের মধ্যে। ১৯৭৪ সালের সন্ত্রাসের ভয়ঙ্কর দিনগুলির প্রেক্ষাপটে লেখা কবিতা আমরা পাই 'স্বাধীনের এই স্বাদ' কাব্যে। কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় ‘স্বভাবিত’ কবি, ‘স্বভাবকবি’ নন। তিনি শব্দ নিয়ে যেমন ভেবেছেন তেমনি কাব্য বুননেও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর কাব্যে আবেগ আছে ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি শ্রমনিষ্ঠ, শিল্পনিষ্ঠ কবি। ড. অজয় কুমার ঘোষ কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন বুলগেরিয়ার কবি নিকোলা ভ্যাপসারভের। তিনিও ছিলেন কারখানার শ্রমিক। বয়লারে কয়লা জোগানো ছিল তাঁর কাজ। আলোচ্য কবির ক্ষেত্রেও এই ঘটনা সত্য। আগামীকালের কাজ কবির জীবন ও কাব্যের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনদর্শন ও আত্মানুভূতিকে ফুঁটিয়ে তোলা।

গ্রন্থপঞ্জী:-

<u>আকর গ্রন্থ:</u>

(ক) কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০১২।

(খ) কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, কিছু তো দাঁড়িয়ে নেই, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ,জানুয়ারি ২০০৭।

(গ) কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, চর্তুচশপদী কবিতা, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৭।

(ঘ) কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, আমাদের কাজের মাসি, প্রকাশক, একুশ শতক, কলকাতা। প্রকাশ কাল, জুন ২০১৮।

(ঙ) কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, মানুষের সঙ্গ ছাড়িনি, শ্রমশ্রী প্রকাশন, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, ১মে ২০১৪।

(চ) কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, ভীষণ উদ্বেগে আছি, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৩।

(ছ) কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, শ্রমিক কবির প্রতিবাদী কবিতা, শ্রমশ্রী প্রকাশন, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, ১জানুয়ারী ২০১৬।

(জ) কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, সেদিন ও এদিনের কবিতা,শ্রমশ্রী প্রকাশন,কলকাতা।প্রকাশ ৫অাগষ্ট২০১৯।

<u>সহায়ক গ্রন্থ</u>

(ঝ) অশোক কুমার মিশ্র,আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা(১৯০১-২০০৮): প্রকাশক, দেজ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২।

(ঞ) তরুণ মুখোপাধ্যায়: ছয় দশক নয় কবি: সহযাত্রী প্রকাশনা, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, ২৭ অগাষ্ট,২০০৬।

(ট)অভিজিৎ মজুমদার, শৈলিবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ব,কলকাতা, দেজ পাবলিশিং। ২০০৭।

(ঠ) আশিষকুমার দে, সাহিত্যালোচনা ও শৈলিবিজ্ঞান: কলকাতা, সাহিত্য প্রকাশ।১৯৯২।

<u>পত্র-পত্রিকা</u>

(ঢ) কবিতা সংগ্রহ ও বিদ্বগ্ধজনের মতামত: কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়(সম্পা:), শমশ্রী প্রকাশন, কলকাতা। ২২মে ২০১৩।

(ড) প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা: সম্পাদক, অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়: প্রকাশক, অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, দুগার্পুর, মে-অক্টোবর ২০১৭।
(ণ) প্রতিবাদ, সম্পাদক, অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, মুদ্রণ, মীরা কম্পিউটার, দুর্গাপুর, নভেম্বর ২০১৯।